খণ্ড ৪ ভাবনগর ফেব্রুয়ারি ২০১৬
Vol. 4 BHĀBANAGARA February 2016

আধুনিক বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব

ফেরদিনান্দ স্যারডিলা

আধুনিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের পথনির্দেশক ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

Modern Gaudiya Vaishnavism in Bengal

Ferdinando Sardella

Abstract

The article offers an overview of a recent publication by the author about the life and work of Bhaktisiddhanta Sarasvati (1874-1937), a Vaishnava guru of the Bengali school of Chaitanya (1486-1534), who managed to establish a pan-Indian movement for the modern revival of traditional personalist bhakti that today encompasses both Indian and non-Indian populations around the world. To most historians, the period between 1815 and 1914 is known as Britain's Imperial Century, when the power of British cultural influence was at its height, most especially in Calcutta, India, the so-called "jewel" of the British crown. Here the profound admixture of Western and Indic social structures, values and ideas gave rise to a new indigenous middle-class known as the bhadralok: the class responsible for what is popularly known as the Bengal Renaissance, and for producing such transformative figures as Rammohun Roy and Swami Vivekananda, both of whom believed non-dualism to be the fundamental expression of Indic thought. As a result of their efforts, modern Hinduism gradually came to be identified with Vedantic non-dualism (advaita) in both India and the West—an outcome that has historically obscured personalist bhakti strands. To redress this imbalance, the article explores Bhaktisiddhanta's background, motivation and thought, especially as it relates to his forging of a modern traditionalist institution for the revival of Chaitanya Vaishnava bhakti. That institution, originally known as the Gaudiya Math, has a number of contemporary global offshoots, the best known of which is the International Society for Krishna Consciousness.

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা নিয়ন্ত্রণের একশত নয় বছর পর, ব্রিটিশ রাজতন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের শাসন গ্রহণ করার ষোলো বছর পর এবং ভারতের স্বাধীনতার তিয়াত্তর বছর আগে, তখন ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ। এটি এমন একটি সময় যখন ভারত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি। শ্রীকৃষ্ণের অবতার খ্যাত শ্রীচৈতন্য দেব (১৪৮৬-১৫৩৪)-এর পর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন একজন বৈষ্ণব গুরু ও ঐতিহ্যের পথ-নির্দেশক। তিনি দুই শতাব্দী বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান এবং পতনের দুটি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি এমন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গৌড়ীয় মঠ) গঠন করেছিলেন যা ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির সদুত্তর দিতে পেরেছিল এবং সেটি পরে উত্তর-ঔপনিবেশিক [post-colonial] ও তাঁর পরবর্তীকালে লক্ষ করা যায়।

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের জন্মের সময়ে একটি গ্রামীণ অপ্রকাশিতনামা থেকে হকলকাতা হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের "দ্বিতীয় শহর", যেটি এডিনবরা এবং গ্লাসগোর চেয়ে বৃহত্তর এবং লন্ডন ও প্যারিসের থেকেও মহৎ, সুন্দর, জাঁকজমক এবং জনসংখ্যাপূর্ণ। কিন্তু আর চারটি মহানগরীর মতো কলকাতারও একটি অন্ধকার দিক ছিল। রুডইয়ার্ড কিপলিং কলকাতার বিবরণে বলেছিলেন—"একটি শহর যেটি রাতে ভয়ঙ্কর; দারিদ্র, ক্ষুধা, দাঙ্গা ও বিশৃঙ্খলা পরিপূর্ণ।"

উপরের বর্ণনায় কলকাতার ব্রিটিশ ও ভারতীয় জনগোষ্ঠী মধ্যে বিরাজমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিভাজনের কথা প্রকাশ করেছে, প্রকৃত অর্থে যাকে "হোয়াইট সিটি" ও "ব্ল্যাক সিটি" বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক প্রশাসন এবং ব্যবসার ক্রমান্নতির ফলে গড়ে উঠেছিল একটি নতুন ঘরোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যাদের "ভদ্রলোক" বলা হতো। এই শ্রেণিতে মুসলমানদের তুলনায় বাঙালি হিন্দুরা ছিল বেশি, যদিও প্রথমে মূলত শুধু ধনী ভূমি মালিকদের সংখ্যা ছিল বেশি, পরবর্তীকালে অফিসকর্মী, শিক্ষক, সাংবাদিক ও আইনজীবীদেরও এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই শ্রেণির মানুষ ব্রিটিশ বণিকদের মধ্যস্থতা, দোভাষী এবং আইনি ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী এবং অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহকারীর কাজ করতেন। তাদের "বাবু"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রবর্তক চৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অনুসারিদের সংকীর্তন

বলা হতো, যারা ইংরেজিতে দক্ষ ছিল। এই ভদ্রলোকেদের বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষা গ্রহণ করার দৃঢ় অঙ্গীকার। এটি তাদের সাফল্যের ভিত্তি ছিল। এই শ্রেণির মানুষ চরিত্রগতভাবে ব্রিটিশ অভ্যাস, সংস্কৃতি, স্বাদ এবং একটি নতুন আধুনিক জাতীয় পরিচয় আলিঙ্গন করার চেষ্টায় রত ছিল। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দশকে তরুণ বাঙালি হিন্দু যুবকেরা এই ভদ্রলোক সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। এই যুবকেরা মূলত নাগরিক এবং পেশাদারী পরিষেবা, কর্মসংস্থান লাভ করতে আগ্রহী ছিল এবং তাদের চেষ্টা থাকতো ইংরেজি মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হওয়া। উল্লেখ্য, ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় আদর্শে গড়ে ওঠে বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং এই প্রভাবশালী শ্রেণির চিন্তাধারায় শুরু হয় বাংলার নবজাগরণ (Bengal Renaissance)। এদের প্রধানরা আধুনিক ভারতের উন্নয়নের নেতা হয়ে ওঠেন, এবং আধুনিকতার মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আরেকটি মৌলিক অভিব্যক্তি হিসাবে অদ্বৈত (অদ্বৈতবাদ বা অদ্বৈত বেদান্ত) প্রচার করতে থাকেন। এদের মধ্যে রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) এবং স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) ছিলেন অগ্রগণ্য।

ঐতিহাসিকভাবে প্রাসঙ্গিক উপরোক্ত ভদ্রলোকেদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে পরিচিত মুখ ছিলেন। তিনি বেদান্তের একটি আধুনিক সংস্করণ উপস্থাপন করেছিলেন, যেটির আনুপ্রেরণায় ছিল শঙ্করের দার্শনিক মত। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে এটি হয়ে ওঠে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের হিন্দুধর্মকে বোঝার একটি সহজ মাধ্যম, যেটি আজও প্রচলিত। সংক্ষেপে, বলা যায় তার সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে মৌলিক আকারে, এটি ব্রহ্ম বা জ্ঞানের সম্ভাব্য একটি প্রায়োগিক বিষয়, অবয়ব এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যেটি শেষপর্যন্ত অবাস্তব তথা নিরাকার

স্বামী বিবেকানন্দ

সত্তা হতে চূড়ান্ত পর্যায়ে পূর্ণতা পায়; যা আদি, সর্বত্র বিরাজমান ও নিরাকার সত্তায় গঠিত—যাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। এই চিন্তাধারা হিন্দু ধর্মীয় জনগণের মধ্যে প্রচলিত জনপ্রিয় দেব ও দেবীর আরাধনার বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অদ্বৈতবাদী মতের বিশেষ তাৎপর্য ছিল মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী এবং সব মানুষের সমতার উপর, সে কারণে সমমাত্রিক মতাদর্শের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। বস্তুত, গান্ধী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতার মাধ্যমে অদ্বৈতবাদী পদ্ধতি স্বীকৃতি পায় এবং জাতীয় ও ঔপনিবেশিক অনুক্রমের ধারণায় অসিদ্ধ এবং বিধিসম্মত পশ্চাত্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সাহায্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দকে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম সংসদে বেদান্ত দর্শন উপস্থাপন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়ে। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত ভালভাবে গ্রহণ করা হয় এবং হিন্দুতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি বোঝার ক্ষেত্রে পশ্চিমের পদ্ধতি দ্রুত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী এই সময় জীবিত এবং কর্মের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি একজন ভদ্রলোক হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন এবং তাঁর পশ্চিমি চিন্তার এবং ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময়ে আপাতদৃষ্টিতে প্রগতিশীল স্রোত থেকে এক পদক্ষেপ এগিয়ে ছিল। ভক্তিসিদ্ধান্ত একটি মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন, তিনি দাবি করতেন—সেটি ভারতীয় শাস্ত্রীয় চিন্তার একটা ফলপ্রসূ অনুধাবন। এই ঐতিহ্য মূলত চৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম নামে পরিচিত এবং তার ধার্মিকতা ভক্তির আকারে প্রকাশিত বলা হয়। চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম খুব ঐতিহ্যগত ছিল এবং উপরন্তু তাদের বহু নিরবধি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, যেটির অর্থ দাঁড়ায়ে যে—এটি ভদ্রলোকের ধর্মীয় পছন্দের তালিকায় খুব কম সংখ্যা দ্বারাই চিহ্নিত করা হয়েছিল। এটি ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয়—যেটি ছিল ভক্তি (নিষ্ঠার) একটি আকার, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার আরাধনা করা হতো এবং পরে এটি আরও প্রচারিত হয়ে ওঠে—চৈতন্যদেবের জীবন ও শিক্ষার মাধ্যমে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে এটি বাংলা জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ লোকেদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল। চৈতন্যদেবকে বাঙালি বৈষ্ণবরা মনে করেন সর্বশেষ অবতার বা শ্রীকৃষ্ণ সরাসরি নিজকে প্রকাশ করেছেন চৈতন্যরূপে।

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

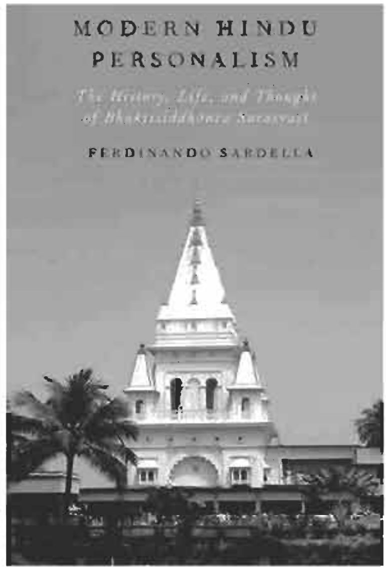

ফেরদিনান্দ স্যারডিলা রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

যদিও এই ঐতিহ্যর মূলত একটি গভীর দার্শনিক ভিত্তি ছিল, এটি বছরের পর বছর ধরে তিনটি সাধারণ ধরনের মধ্যে ভাগ হয়েছে—যা বিশেষ করে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছে আনন্দদায়ক হয়ে ওঠেনি। প্রথমত এটির জনপ্রিয় আকার—যাকে ভাবপ্রবণ, নৈতিকভাবে দুর্বল এবং লম্পট হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং এই ধর্মকে অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ প্রতিনিধি মনে করা হতো; অন্যটি বর্ণ ভিত্তিক আকার—যা অভিজাত পক্ষপাতদুষ্ট, সামাজিকভাবে অসংবেদনশীল এবং খুব বেশি পুরানো হওয়ায় আধুনিক সময়ের সঙ্গে পদক্ষেপের বাইরে বিবেচনা করা হতো; এবং তৃতীয় তার রহস্যময়-তপস্বী আকার, যা তারা খুব পারলৌকিক বলে মনে করত। এখানে সবাই আশ্চর্য হতে পারেন যে, এই ঐতিহ্যে কি এমন ছিল—যা ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীকে আকৃষ্ট করেছিল? উত্তর হল—তাঁর বাবা তাঁর জীবনেকে প্রভাবিত করেন, এবং তিনি নিজে পরিচিত ছিলেন মূল মধ্যযুগীয় গ্রন্থের সাথে যেগুলি লিখেছিলেন চৈতন্যের সাক্ষাৎশিষ্য রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও জীব গোস্বামী। ফলস্বরূপ, তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন—এই তিন সংকলকের রচনাসমূহ সমসাময়িক কালের মূল দার্শনিক, নৈতিক, সুশৃঙ্খলা ও সমমাত্রিক ঐতিহ্যের ভুল ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ।

অবশেষে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন মূল ঐতিহ্যের উপর, এবং তা শিক্ষা ও প্রচারের জন্য তিনি তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক জীবনকে উন্নত করেন। প্রধানত তিনি তাঁর কাজ শুরু করেন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয় মঠ স্থাপনার মাধ্যমে, পরে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন, মুদ্রণ ও ক্লাসিক্যাল এবং মধ্যযুগীয় গ্রন্থ বিতরণ ও মূলের ব্যাখ্যা রচনার মাধ্যমে। জীবনের শেষ বছরগুলিতে তিনি সারা ভারত ভ্রমণ করেন, বক্তৃতা প্রদান করেন এবং শিষ্যদের দীক্ষা

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার গৌড়ীয় মঠ ভবন

দেন এবং এ জন্য তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ও ইউরোপীয় ব্যক্তিত্বদের সম্মান লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত বিতর্কিত এবং রীতিবিরুদ্ধ ছিলেন; এবং বর্ণ বৈষম্য, লৈঙ্গিক ভূমিকা, বর্ণবাদ ও ব্রাহ্মণ অভিজাত বিশেষাধিকার বিষয়গুলির বিরুদ্ধে তিনি নির্ভয়ে কথা বলেছিলেন। এই ধরনের বৈষ্ণব-সন্ন্যাস (উপরত জীবন) এবং জন্মের বদলে দক্ষতার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ-দীক্ষা দেওয়া নতুন প্রথা প্রতিষ্ঠা করেন। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা, যোগাযোগ ও পরিবহন আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। আধুনিক অদ্বৈত বেদান্তের মূল স্রোতের প্রতিকূলে তাঁর বক্তব্য, পাশাপাশি রাজনৈতিক ও মানবিক কাজে ধর্মীয় সক্রিয়তায় তাঁর সমালোচনা খুব বিতর্কিত ছিল এবং তার জন্য তাঁকে ভদ্রলোকেদের মধ্যে একটি বিতর্কিত ব্যক্তি বলে গণ্য করা হতো।

এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল ভক্তির শিক্ষা—যেটি তিনি সবার সামনে পেশ করেন, এটি অদ্বৈতবাদের বিপরীত ছিল এবং এটি তাঁর সমসাময়িক কালের অধিকাংশে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর সময়ে প্রগতিশীলদের পদক্ষেপের বাইরে ছিল উচ্চ রাজনৈতিক ও মানব-হিতৈষী দর্শনিক প্রবণতা। তাঁর শিক্ষায় দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরবাদ বা আস্তিকতা ছিল, এবং তিনি সর্বোচ্চ সত্য বা "জগদীশ্বর" উপস্থাপন করেছিলেন—যেটি ব্যক্তির অধিক নৈর্ব্যক্তিক এবং সেই কারণে আকারে অধিকৃত বস্তু বা একটি দৈহিক আকৃতির নিরাকারতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বৈষ্ণব প্রতিমা সংক্রান্ত চর্চা এবং চূড়ান্ত বাস্তবতা উপস্থাপন করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হন—যেটি কিছুতেই জনপ্রিয় মনোবৃত্তি এবং

যৌনকামনাউদ্রেগকারী (eroticism) নয়। বরং যেটি সরাসরি অত্যাধুনিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ এবং অন্যদের অদ্বৈতবাদী মতামত বিরোধিতা করত।

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর গৌড়ীয় মঠের (যে প্রতিষ্ঠানটি তিনি ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন) কাজের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য সারা ভারতবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও তাঁর আন্দোলনে, ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগের পরে অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের জন্য যার কিছু ব্যাঘাত ঘটেছিল, পরে যা শেষ হয় হঠকারিতায়, এবং মনে হয়েছিল যে তাঁর জীবন ও কাজগুলি শুধু ধর্মীয় ইতিহাসে একটি পাদটীকা হয়ে থাকবে। ত্রিশ বছর পরে, আরেকজন নতুন ব্যক্তিত্ব, ভক্তিবেদান্ত স্বামী, যিনি তাঁর শিষ্য ছিলেন, এই আন্দোলনকে বিস্ময়কর উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং রাতারাতি চৈতন্যের শিক্ষার উপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, হাজার হাজার অভারতীকেও তা আকর্ষণ করে। এই চর্চা বা গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু সম্প্রতিক কালের সৃষ্টি নয়, বরং পূর্বেও এ ধরনের উন্নয়ন চেতনা ছিল।

আধুনিক হিন্দু ধর্মের রহস্যময় ব্যক্তি হিসেবে ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বামীর জীবন, সাধনা ও চিন্তা নিয়ে আমি *Modern Hindu Personalism, the History, Life, and Thought of Bhaktisiddhanta Sarasvati* শীর্ষক পিএইচ.ডি. গবেষণা সম্পন্ন করি। যা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণাকর্মের প্রথম অধ্যায়ে একটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে ভারতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর জীবন ও কাজ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এতে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও ধ্যানধারনা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান, বাংলার নবজাগরণের উত্থান, নবজাগরণের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মপ্রচারকদের বিরোধিতা এবং পরিশেষে ব্রিটিশ ও ভদ্রলোকদের দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের বিষয়ে আলোচনা প্রযুক্ত হয়েছে।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে—ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর শৈশব, শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা প্রধান উৎস; সেইসাথে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা এবং ভক্তির ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু আমাদের লক্ষ্য ছিল উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব, সেইসাথে তাঁর প্রচেষ্টা একজন ব্যক্তিকে বা নিম্ন-স্তরের কারো মধ্যে ধর্মীয় পরিবর্তন আনা (একটি নতুন ধর্মীয় পরিচয় তৈরি করা) এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক বা মধ্যবর্তী পর্যায়ের উপরেও পরিবর্তন আনা (একটি আধুনিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করা)।

তৃতীয় অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে—আন্তর্জাতিক (বা ম্যাক্রো) পর্যায়ে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম ছড়িয়ে দেবার জন্য ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর প্রচেষ্টা; সেই লক্ষ্যে তিনি তাঁর শিষ্যদের লন্ডন এবং বার্লিনে পাঠিয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে, এখানে একটি বিস্তারিত বিবরণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্রিটিশ অভিজাতদের সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের লন্ডন ও নাৎসি জার্মানিতে সাক্ষাৎ এবং তাঁদের ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর বার্তা উপস্থাপন করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ভ্রমণরত ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বামী, ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ

চতুর্থ অধ্যায়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হতে ধর্ম, সমাজ ও চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মে লৈঙ্গিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে বিবেচনা করা হয়েছে তাঁর ঐতিহ্যের মৌলিক সংজ্ঞায়িত করার সক্ষমতা এবং কিভাবে তাঁকে অনুমতি দিয়েছিল গতিশীল ধর্মীয় পরিবর্তন প্রচার করবার। এখানে দার্শনিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে পারস্পরিক একটি সম্পর্ক স্থাপন এবং কিভাবে এই ভক্তির মাধ্যমে তাঁর আন্দোলনের একটি পুনর্গঠন হয়েছে তাই নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর জীবন এবং কর্ম সমসাময়িক হিন্দুধর্মের একটি শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে রাখা হয়েছে, এবং তাঁর কাজের গুরুত্ব আর অবদান তুলনা করা হয়েছে—অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তি, যেমন—স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সাধক-দার্শনিকের সঙ্গে। এখানে সংস্কার বনাম পুনরুত্থান বিবেচনা করা হয়েছে। অবশেষে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর কাজ যুক্ত করা হয়েছে একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের সঙ্গে যাতে আছে এখন হাজার হাজার আমেরিকা ও ইউরোপের অনুশীলনকারী এবং তাদের মধ্যে অনেকেই সারা ভারত জুড়ে সম্মানিত হয়েছেন চৈতন্য-ভক্ত একজন প্রতিনিধি হিসাবে, এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত প্রতিনিধি হল ISKCON (ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব কৃষ্ণ ভাবনামৃত) যেটি স্থাপনা করেছিলেন ভক্তিসিদ্ধান্তের একজন শিষ্য বাংলার অভয়চরণবৃন্দ

গুরু ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বামী

শিষ্য ভক্তিবেদান্ত স্বামী

ভক্তিবেদান্ত স্বামী। এই অধ্যায় Shmuel Eisenstadt "একাধিক modernities"-এর সঙ্গে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর অস্বাভাবিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গ্রন্থটির পরিশিষ্টে কি করে বিতর্কিত এবং কঠিন ধরনের শব্দ "হিন্দু", "হিন্দুধর্ম" এবং "ভক্তি" নির্ধারণ করা যায়—তা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিকগত উপায় উপস্থাপন করা হয়েছে, তার সাথে বিভিন্ন উপায়—যার মাধ্যমে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা হয়েছে। অবশেষে অদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী বেদান্তের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে।

কিভাবে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী চৈতন্যের ভক্তি ঐতিহ্য অনুবাদ, স্থাপনা এবং এগিয়ে নিয়ে গেছেন আধুনিক ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির পরিবেশে, এবং কিভাবে এটি হিন্দুধর্মের আধুনিক ইতিহাসের জায়গা এবং গুরুত্বর সঙ্গে যুক্ত এই গবেষণাকর্মে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখানো হয়েছে—আধ্যাত্মিক বা অবস্তুগত বৈশিষ্ট্য ছড়িয়ে পড়ে ভক্তিসিদ্ধান্তের চিন্তার সম্পূর্ণতায়, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্থার বোধশক্তির উপর। তাঁর জন্য ব্যক্তিত্ব বোঝানো, মানব অস্তিত্বের পরম সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্ব হতে শুরু, এক জীবন্ত নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মাত্রা মনুষ্য জাতির কাঠামো, এবং সময় আর স্থান জুড়ে উপস্থিতি এবং দায়িত্বে নিয়োজিত একটি মৌলিক জ্ঞানকে প্রদান করা হয়েছে। ধারণা ছিল একটি অপার্থিব ব্যক্তি—যে হল আত্মসচেতন ও তার ধারণা হবে স্বাধীন এবং নিজেস্ব পছন্দভিত্তিক; যার থাকবে হৃদয়ে হৃদয়ে সম্পর্ক, যে অন্যদের উপর কোনো কিছু আরোপ করতে পারবে না। তাঁর ধর্মধারায় ব্যক্তিত্ব বোঝাতে শুধু বিমূর্ত অধ্যাত্মিক নীতি অন্তর্ভুক্ত ছিল না; কিন্তু মানুষের আচরণ, কর্ম ও সিদ্ধান্ত, মনোবল সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁকে বর্ণ প্রথা ও ব্রাহ্মণ্য গোঁড়া সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে

এবং সেইসাথে তাঁর আধ্যাত্মিকভাবে আধুনিক বিশ্বের সংস্কার করার ইচ্ছা অনুপ্রাণিত করেছিল। এটা তাঁর ধর্ম, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উচ্চতর বাস্তবতা এবং ধর্মীয় উপলব্ধির চূড়ান্ত লক্ষ্য তাঁর মৌলিক বোঝার ক্ষমতায় অর্থাৎ ঐশ্বরিক প্রেমে প্রভাবিত করেছিল। এটি তাঁকে প্রধান ঈশ্বরবাদ বা আস্তিকতার ঐতিহ্য বুঝতে সুযোগ দিয়েছিল, খ্রিষ্টান এবং ইসলামের অংশীদার হিসেবে, এবং সেটি তাঁর দার্শনিক সংগ্রামকে সাহায্য করেছিল যারা মানবিক পদ্ধতির বিরোধিতা করে দাঁড়িয়েছিল—অতীত ও সমকালীন monists এবং বস্তুবাদীরা, যাঁদের পরম প্রশ্নবিদ্ধ বোঝা তাঁর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ ভিত্তিক।

পূর্ববর্তী গবেষণার সঙ্গে তুলনা করলে এ গবেষণাকর্মটির ভিন্ন মাত্রার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়; যথা—প্রথমত, সমসাময়িক ভক্তি সংক্রান্ত সমীক্ষা এখনো তুলনামূলকভাবে প্রান্তিক ও তেমনভাবে উন্নত নয়; সে কারণে এই গবেষণাকর্মের প্রথম অধ্যায়ে সমকালীন হিন্দু আন্দোলনের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, এটি অবশ্যই একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন; এতে বিষয়গত, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে, এটি বোঝাতে বিকল্প কণ্ঠকে বর্জন করেছে—দ্বৈতবাদীদের সহ এবং আস্তিকদের প্রবণতাসমূহ। দ্বিতীয়ত, চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম ব্যাপকভাবে তার মধ্যযুগীয় ও প্রাক-আধুনিক ইতিহাসের জন্য গবেষণা করা হয়েছে, যখন তার আধুনিক উন্নয়ন কম পরিচিত ছিল। তৃতীয়ত, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আবির্ভূত নতুন ধর্মীয় আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, এক্ষেত্রে অনেকটাই মনোযোগ আকর্ষণ করেছে ISKCON (এটি 'হরেকৃষ্ণ আন্দোলন' নামেও পরিচিত); অবশ্য, এই আন্দোলনের

জাপানের টোকিওতে সুইডেনের স্টকহোম ইউনির্ভাসিটির অধ্যাপক ফেরদিনান্দ স্যারডিলা, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কানা তোমিজাওয়া, ন্যাশনাল তাইওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ-টিং লী এবং সোপিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো কুনিকো হিরানো ও বাংলা একাডেমির সহপরিচালক সাইমন জাকারিয়া

বাংলা শিকড় সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তবে, বাংলাদেশ এবং বাংলার অন্য অঞ্চলেও যে ইসকোন-এর শাখা রয়েছে তা আমাদের অজ্ঞাত নয়। চতুর্থত, এই গবেষণা হিন্দুধর্ম ও ইউরোপের মিথষ্ক্রিয়ায় সৃষ্ট ইতিহাসের শূন্যতাকে পূর্ণ করা হয়েছে।

গ্রন্থনির্দেশ

Ferdinando Sardella, *Modern Hindu Personalism, The History, Life and Though of Bhaktisiddhanta Sarasvati* (Oxford University Press, 2013)